১৯৩৯ সালে ইউরোপ স্পষ্টতই দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জার্মানির ক্রমবর্ধমান দাবীর সামনে ইতিপূর্বে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া নত হয়েছিল। কিন্তু তাতেই জার্মান আগ্রাসন থেকে থাকেনি। পোল্যান্ড দখল করে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপকে পদানত করে নাৎসিরা ইউরোপের একচ্ছত্র শাসক হতে চাইছিল। পোল্যান্ডের প্রতি বিট্রেন ও ফ্রান্সের নিরাপত্তার আশ্বাস ছিল নাৎসি আগ্রাসনের প্রতিবন্ধক। এই পরিস্থিতিতে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উনিশশো ত্রিশের দশকের ইউরোপীয় শক্তিসাম্যের পরিবর্তন এবং বিশ্ব রাজনীতির আলোড়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল জার্মান বিদেশনীতি। আবিসিনিয়া, স্পেন, মাঞ্চুরিয়া, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার মত নানা স্থানে নাৎসি বিদেশনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। নাৎসি বিদেশনীতি সাবেক মিত্রদের শত্রুতে পরিণত করেছে, আবার একসময়ের বিরোধীকে জার্মানির বন্ধু শক্তিতে পরিণত করেছে। এই বিদেশনীতির না পর্যায় সেই জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। উদ্দেশ্যবাদী ও গঠনবাদী ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ নাৎসি বিদেশনীতির একপর্ব থেকে অন্যপর্বে উত্তরণের নানা দিক বুঝতে আমাদের বিশেষ ভাবে সহায়তা করে।

৮.১০ অনুশীলনী

জাপানের আগ্রাসন ও মাঞ্চুরিয়া সংকট

১। অনধিক পঞ্চাশটি প্রশ্নের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন (প্রয়োজনে 'পরিশিষ্ট' দেখুন) :

(ক) জাপানের 'দ্বিগুণ জাতীয়তাবাদ' বলতে কী বোঝান হয়?

(খ) মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি আগ্রহের কী কারণ ছিল বলে আপনি মনে করেন?

(গ) 'তানাকা স্মারক'-এ ঘোষিত বিদেশনীতি ইতিপূর্বের জাপানি বিদেশনীতির তুলনায় কিভাবে ভিন্ন ছিল?

(ঘ) জাপান শানতুং উপদ্বীপে সৈন্য পাঠালে তার ফল কী হয়েছিল?

(ঙ) 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' বিষয়ে আপনার ধারণা লিখুন। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ কী দিতে পারেন?

(চ) 'সাকুরাকাই' কী? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ছ) মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথে চীনের নাশকতা মূলক কাজটি কি ছিল বলে জাপান দাবী করে?

(জ) লিটন কমিশন কী? এর ঘোষিত উদ্দেশ্য কী ছিল?

২। অনধিক দুটো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

(ক) জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলের আন্তর্জাতিক প্রভাব কী হয়েছিল?

(খ) মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি আগ্রাসন নিয়ে জাতিসঙ্ঘের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

আবিসিনিয়া যুদ্ধ

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

(ক) স্ট্রেসাফ্রন্ট' কি? কাদের নিয়ে কী উদ্দেশ্য এটি গঠিত হয়েছিল? এটির পরিণতি কি সার্থক হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

(খ) আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রেক্ষাপট হিসাবে ইতালির পরিবর্তনশীল বিদেশনীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। প্রসঙ্গত 'দি আনুনজিও-র কার্যকলাপের উল্লেখ করুন।

(গ) আবিসিনিয়াকে নিয়ে ইতালির আগ্রহের কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

(ঘ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের প্রভাব কী কী হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়গুলো আলোচনা করুন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপট কী ছিল?

(খ) স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষতাবাদী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর নিরপেক্ষ থাকতে চাওয়ার কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

(গ) আপনি কি মনে করেন যে স্পেনের গৃহযুদ্ধ কার্যত স্পেনের মাটিতে এক ইউরোপীয় যুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়গুলো আলোচনা করুন।

রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) রোম-বার্লিন শক্তি গঠনকালে জার্মানির প্রতি ইতালির পরিবর্তনশীল দৃষ্টি-ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(খ) কমিনটার্ন-বিরোধী জোট কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?

(গ) বার্লিন-টোকিও সম্পর্কের বিবর্তন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে কিভাবে জাপান ক্রমশ অক্ষশক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠল তা বিশ্লেষণ করুন।

তোষণনীতি

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) তোষণনীতি বলতে কী বোঝান হয়?

(খ) ব্রিটেনের তোষণনীতি কী ছিল সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

(গ) ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়ক ও সামরিক নায়কদের জার্মানির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) ব্রিটেনের তোষণনীতি সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণায় কী কী পরিবর্তন এসেছে তার বিশ্লেষণ করুন।

(খ) ফ্রান্সের তোষণনীতির মৌল বৈশিষ্ট্য কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

১। অনাধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) 'সংযুক্তিকরণ' (Anschluss) বলতে কী বোঝান হয় লিখুন।

(খ) সুদেতান জার্মানদের প্রতি জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল? জার্মানির আকাঙ্খা পূরণ ত্বরান্বিত হতে পেরেছিল কেন?

(গ) নাৎসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তির তাৎপর্য কী ছিল?

(ঘ) ব্রিটেনের 'Policy of guarantee' কী ছিল? কিভাবে এই নীতি ব্রিটেনকে পোলিশ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করেছিল?

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) ১৯৩৯ সালের ইউরোপীয় পরিস্থিতির মূল্যায়ন করুন।

জার্মান বিদেশনীতি (১৯৩৩-৩৯)—ইতিহাসবিদ্যার নানা ধারা

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

(ক) উদ্দেশ্যবাদী ঘরানার ঐতিহাসিকদের মূল বক্তব্য লিখুন।

(খ) নাৎসি জার্মানির 'বাসভূমি' (Labensraum) তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন?

(গ) গঠনবাদী ঘরানার ঐতিহাসিকদের মূল বক্তব্য লিখুন।

(ঘ) গঠনবাদীদের মতে নাৎসি সম্প্রসারণমূলক যুদ্ধের প্রধাণ কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

২। অনধিক তিনশো শব্দের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

(ক) উদ্দেশবাদী ঘরানার বিভিন্ন ইতিহাসবিদদের বক্তব্য আলোচনা করুন।

(খ) গঠনবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্য আলোচনা করুন।

৮.১১.১ পরিশিষ্ট ১ : জার্মানি, ইতালি ও জাপানের রষ্ট্রনায়ক বৃন্দ (১৯১৮-১৯৪১)

সময়কাল	জার্মানি/চ্যান্সেলর	ইতালি/প্রধানমন্ত্রী	জাপান/প্রধানমন্ত্রী
নভেম্বর ১৯১৮	ম্যাক্স ফন বাডেন	ভিত্তরিও অরলান্দো	হারা কেই (তাকাশি)
নভেম্বর ১৯১৮	জনপ্রতিনিধিদের সরকার। প্রধান সদস্যরা হলেন এবার্ট, ফিলিপ শেইডেমান ও ল্যান্ডসবার্গ। স্রাজ্যিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরিচালিত সরকার।		
ফেব্রুয়ারি ১৯১৯	ফিলিপ শেইডেম্যান		
জুন ১৯১৯	বাউয়ের		
মার্চ ১৯২০	হারমান মুলার		
জুন ১৯২০	ফেহ্রেনবাখ	জিওভানি জিওলিত্তি	
মে ১৯২১	ভির্থ		
জুলাই ১৯২১		বোনোমি	
নভেম্বর ১৯২১			উচিদা ইয়াসূয়া
নভেম্বর ১৯২১			তাকাহাশি কোরেকিয়ো
জানুয়ারি ১৯২২			কাতো তোমোসাবুরো
ফেব্রুয়ারি ১৯২২		ফাক্তা	

অক্টোবর	১৯২২		বেনিতো মুসোলিনি
নভেম্বর	১৯২২	কুনো	
অগাস্ট	১৯২৩	গুস্তাভ স্ট্রেসেমান	
সেপ্টেম্বর	১৯২৩		ইয়ামামোতো গোমবেই
নভেম্বর	১৯২৪	মার্ক্স	
জানুয়ারি	১৯২৪		কিয়োয়ুরা কেইগো
জানুয়ারি	১৯২৫	লুথার	
জুন	১৯২৪		কাতো তাকাচি
মে	১৯২৬		
জানুয়ারি	১৯২৬		ওকাৎসুকি রেইজুরো
মে	১৯২৬	মার্ক্স	
এপ্রিল	১৯২৭		তানাকা গিইচি
জুন	১৯২৮	হারমান মুলার	
জুলাই	১৯২৯		হামাগুচি ওসাচি
মার্চ	১৯৩০	হাইনরিশ ব্রুনিং	
জানুয়ারি	১৯৩১		ওকাৎসুকি রেইজুরো
ডিসেম্বর	১৯৩১		ইনুকাই কি
মে	১৯৩২		তাকহাশি কোরোকিয়ো

মে	১৯৩২		সাইতো মাকোতো
জুন	১৯৩২	ফ্রানৎস্ ফন পাপেন	
নভেম্বর	১৯৩২	কুর্ট ফন শ্লাইখার	
জানুয়ারি	১৯৩৩	অ্যাডলফ হিটলার	
জুলাই	১৯৩৪		ওকাদা কেইসুকে
ফেব্রুয়ারি	১৯৩৬		গোতো ফুমিও
ফেব্রুয়ারি	১৯৩৬		ওকাদা কেইসুকে
মার্চ	১৯৩৬		হিরোতা কোকি
ফেব্রুয়ারি	১৯৩৭		হায়াশি সেনজুরো
জুন	১৯৩৭		কোনো ফুমিমারো
জানুয়ারি	১৯৩৯		হিরানুমা কিইচিরো
অগাস্ট	১৯৩৯		আবে নোবুয়ুকি
জানুয়ারি	১৯৪০		ইওনাই মিৎসুমাসা
জুলাই	১৯৪০		কোনো ফুমিমারো
অক্টোবর	১৯৪১		তোজো হিদেকি

৮.১১.২ পরিশিষ্ট ২ : শব্দার্থ

সাধারণ

Socialist/Social Democrat : সমাজবাদী/সামাজিক গণতন্ত্রী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণ ও পূর্বইউরোপে গঠিত বামপন্থী সংগঠন। প্রথম গঠিত হয় জার্মানিতে (১৮৬৯); এরপর বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, নেদারল্যান্ডস্, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, সার্বিয়ায়। ব্রিটেন (লেবার পার্টি) ও ফ্রান্সে (Jaures) ভিন্ন পন্থায় আন্দোলন বিকশিত হয়। ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়েতে বিশেষ শক্তিশালী। ১৮৮৯ সালে সমাজবাদীদের উদ্যোগে প্যারিসে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' সম্মেলন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানি ও ইতালিতে গঠিত সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং ফাসিবাদীদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত সরকারের প্রধান। বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর বিপ্লবী কমিউনিস্টদের বিপরীতে সমাজবাদীরা পুঁজিবাদকে সবলে উৎখাতের পরিবর্তে তার ক্রমঃবিলয়ের নীতিতে বিশেষভাবে আস্থাশীল। জার্মানিতে রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিব্‌ক্‌নেখট সমাজবাদী আন্দোলনের ধারাসম্ভূত সাম্যবাদী বিপ্লবের নেতা।

পরিশিষ্ট ২ : শব্দার্থ

জার্মান

Anschluss : 'সংযুক্তকরণ'। ১৯৩৮ সালের ১২ মার্চ জার্মানির সাথে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তকরণ। নাৎসি বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার। এই লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ার নাৎসিরা আন্দোলন চালায় জার্মানির সমর্থনে। এর মাধ্যমে অস্ট্রিয়াতে নাৎসিরা ক্ষমতায় আসে।

Dolchtoss : 'পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত'। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির উদারপন্থী ও সমাজবাদী রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বিশ্বাসঘাতকতায় এযাবৎ অপরাজিত জার্মান সেনা বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে, জার্মানিতে প্রচলিত এরকম একটি মতবাদ।

Gestapo : তৃতীয় রাইখের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে হারমান গোয়েরিং কর্তৃক স্থাপিত। এক বছর পর হিমলার এর দায়িত্ব পান। যে কোন প্রকার বামপন্থী ভাবধারার বিকাশকে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয়। SS-র গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (তুলনীয় ইতালির OVRA)।

Gleichschaltung : 'সমন্বয়'। চ্যান্সেলর হওয়ার পর হিটলার কর্তৃক সমস্ত স্বাধীন সংস্থা, পরিষদ ও সংগঠনকে ধ্বংস অথবা বশীভূত করার প্রক্রিয়া। খ্রিস্টিয় চার্চও এর আওতার বাইরে ছিল না। প্রাদেশিক স্বশাসনের নীতিকে সম্পূর্ণ

অগ্রাহ্য করে প্রাদেশিক সরকারগুলি ভাঙা হয়। নাৎসিরা সেই স্থলাভিষিক্ত হয়। হিটলারের ক্ষমতারোহনের এক বছর পর 'রাইখ পুনর্গঠন আইন' (৩০ জানুয়ারী ১৯৩৪) তৈরির মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়ার একটি পর্যায় সমাপ্ত হয়। জার্মানি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যা ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

Kampfbund : 'সংগ্রামী সংগঠন'। ১৯২০-এর দশকে হিটলারের নেতৃত্বাধীন NSDAP ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী, সংসদীয় গোষ্ঠীর জোট। দক্ষিণ জার্মানির বাভারিয়া অঞ্চলে 'জাতিয় বিপ্লব' সাধনের কাজে নিয়োজিত এবং জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদের জন্য সদাসচেষ্ট সংগঠন। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসের তথাকথিত Munich Putsch-এর সংগঠন।

Kapp Putsch : ওলফ্‌গ্যাঙ্গ কাপের নেতৃত্বে ও সামরিক নেতা জেনারেল ফন লুটভিট্‌জের পরিচালনায় ১৯২০ সালের মার্চ মাসে জার্মানিতে সংগঠিত অভ্যুত্থান। মাত্র চারদিন স্থায়ী (১৩—১৭ মার্চ) এই অভ্যুত্থানে বার্লিন সমাজবাদীদের হাতছাড়া এবং কাপ চ্যান্সেলার হিসাবে ঘোষিত। পদচ্যুত সমাজবাদী সরকার প্রাদেশিক সমর্থনের মাধ্যমে ও অভ্যুত্থান-বিরোধী শ্রমিক ধর্মঘটের সহায়তায় ক্ষমতায় পুনর্বহাল। এই অভ্যুত্থানে লুটভিটজের অনুগামীরা শিরস্ত্রাণে স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহার করে যা পরবর্তীকালে নাৎসি প্রতীক হয়ে উঠেছে।

Kristallnacht : 'কাচের রাত্রি' ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে সমগ্র জার্মানি জুড়ে ইহুদী নিধন প্রক্রিয়া। ইহুদী বিপনীর কাচ ভাঙচুর করা সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ ছিল, সেই হিসাবে নামটির জন্ম।

Labensraum : 'বাসভূমি'। পূর্ব ইউরোপে, যথা ইউক্রেনে, জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে জার্মান উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে সামাল দেওয়ার পরিকল্পনা। একই সাথে জার্মান সমাজে কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য আবশ্যক জার্মান সম্প্রসারণবাদী নীতির অভিলক্ষ্য। উদ্দেশ্যবাদী ঘরানার ইতিহাসবিদদের মতে জার্মানি তথা হিটলারের বিদেশনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়।

SA [Sturmabteilung] : আর্নস্ট রম (Ernst Rohm) পরিচালিত নাৎসি বেসরকারী সেনাবাহিনী। হিটলারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে ১৯৩৪ সালে এর নেতাদের হত্যা করা হয়।

SS [Schutzstaffel } : প্রাথমিকভাবে হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনী। পরবর্তীকালে হাইনরিশ হিমলারের নেতৃত্ব নাৎসি দলের দমননীতির শক্তিশালী হাতিয়ার পুলিশবাহিনী। SA-কে দমন করার ক্ষেত্রে সক্রিয়।

ইতালীয়

Arditi : ইতালির সেনাবাহিনীর উচ্চবর্গীয় অংশ। সাহস, নৃশংসতা ও দেশপ্রেমের জন্য খ্যাত। মুসোলিনির ক্ষমতারোহণের সময় সহায়ক দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির অন্যতম।

Mare Nostrum	:	'আমাদের সমুদ্র' মুসোলিনির ভাষায় ভূমধ্যসাগরের পরিচয়। ইতালীয় সম্প্রসারণবাদী বিদেশনীতির সূচক।
OVRA	:	১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত পুলিশ বাহিনী (তুলনীয় জার্মানির গেস্টাপো)। টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রের হাতিয়ার।
Popolari	:	'জনপ্রিয় দল'। রোমান ক্যাথলিক রাজনৈতিক সংগঠন প্রথম মহাযুদ্ধের পর সৃষ্ট দুটি গণসংগঠনের অন্যতম। ১৯১৯ সালের নির্বাচনে সমাজবাদীদের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন। ক্যাথলিক ভ্যাটিকানের নির্দেশে পরিচালিত। মুসোলিনি পোপের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলে পোপোলারি চার্চের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়।
Squadristi	:	ফাসিস্ত বাহিনী। বেআইনী পন্থায় শহরে গ্রামে সমাজবাদী সরকারকে উচ্ছেদে নিয়োজিত। সংসদীয় নির্বাচনের সময় ভোটারদের সন্ত্রস্ত করতে ব্যবহৃত।
Trasformismo	:	ইতালির সংসদীয় রাজনীতিতে পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বী গোষ্ঠীগুলির দাবীদাওয়াকে গ্রাহ্য করে পরিচালিত মতৈক্যভিত্তিক সরকার। ১৮৭০-এর দশক থেকে এই পন্থায় ইতালির উদারপন্থী শাসক গোষ্ঠীগুলি সংসদীয় ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনতে সচেষ্ট ছিল।

<u>জাপানি</u>

Sakurakai [Cherry Blossom Society]	:	জাপানের সামরিক অফিসারবর্গের সংগঠন। মাঞ্চুরিয়াকে চীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে সেখানে জাপানি শাসন চালু করা ছিল এর লক্ষ্য। ১৯৩০ সাল থেকে বিশেষ ভাবে এই কাজে নিয়োজিত। কেবল লেফটেনান্ট-কর্নেল ও তার অধস্তন অফিসাররা এর সভ্য হতে পারতেন।
Seiyukai, Kenseikai & Minseito	:	১৯২০-র দশক থেকে জাপানের সংসদে (দায়েত) প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল সেইয়ুকাই এবং কেনসেইকাই। এই দশকের শেষ দিকে সেইয়ুকাই দলের শাসনকালে বিরোধী কেনসেইকাই ও অন্যান্য বিরোধী দল মিশে গিয়ে নতুন বিরোধী দল মিনসেইতো'র জন্ম দেয়।
'দ্বিগুণ দেশপ্রেম'	:	প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে জাপানের জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোর প্রচারিত আদর্শ। এই আদর্শ অনুসারে মনে করা হত যে এর অনুরাগীদের দেশপ্রেমের আবেগ সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপান তার যোগ্য স্থান পাচ্ছেনা, এই জাতীয় ধারণা এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছিল।

৮.১১.৩ পরিশিষ্ট ৩ : সময়পঞ্জি

১৯১৮		
১১ নভেম্বর	:	জার্মানির সাথে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা।
১৯১৯		
১৮ জানুয়ারি	:	প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সূচনা।
২৮ জুন	:	জার্মানির সাথে ভার্সাই সন্ধি।
১৯২০		
১০ জানুয়ারি	:	লিগ অফ নেশনস বা জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।
১৯২১		
১৩ ডিসেম্বর	:	ওয়াশিংটনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চতুঃশক্তি চুক্তি।
১৯২২		
৬ ফেব্রুয়ারি	:	ওয়াশিংটনে নৌ চুক্তি ও নয়দেশীয় সন্ধি স্বাক্ষরিত।
১৬ এপ্রিল	:	জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে রাপালো চুক্তি।
৩০ অক্টোবর	:	মুসোলিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী হলেন।
১৯২৩		
১১ জানুয়ারি	:	ফরাসী ও বেলজিয়াম সৈন্যদের দ্বারা রূঢ় দখল।
১৯২৪		
১ ফেব্রুয়ারি	:	ব্রিটেন কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদান।
২ অক্টোবর	:	জাতিসঙ্ঘে জেনিভা প্রোটকল গৃহীত।
২৮ অক্টোবর	:	ফ্রান্স কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদান।
১৯২৫		
১ ডিসেম্বর	:	লন্ডনে লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত।
১৯২৬		
২৪ এপ্রিল	:	বার্লিনে জার্মানি-সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত।
১০ সেপ্টেম্বর	:	জার্মানির জাতিসঙ্ঘে অন্তর্ভুক্তি।
১৯২৭		
২০ জুন-৪ অগাস্ট	:	জেনিভা নৌ সম্মেলন।
১৯২৮		
২৭ অগাস্ট	:	ব্রিঁয়া-কেলগ সন্ধি (প্যারিস সন্ধি) স্বাক্ষরিত।
১৯২৯		
অগাস্ট	:	হেগ সম্মেলন ; ইয়ং পরিকল্পনা গৃহীত।

১৯৩০

২২ এপ্রিল : লন্ডনে নৌ চুক্তি।

৩০ জুন : রাইনল্যান্ডে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যাপসরণ শুরু।

১৯৩১

২০ জুন : মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভারের মোরাটরিয়াম।

২৮ সেপ্টেম্বর : মুকদেন অন্তর্ঘাত ; চীন ও জাপানের মধ্যে সংঘাত শুরু।

১৯৩২

২ ফেব্রুয়ারি : নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন শুরু।

২৯ নভেম্বর : ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি।

১৯৩৩

৩০ জানুয়ারি : হিটলার জার্মান রাইখের চ্যান্সেলর হলেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি : মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব।

২৭ মার্চ : জাপানের জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ।

১৪ অক্টোবর : জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ও জাতি সঙ্ঘ ত্যাগ।

১৯৩৪

২৬ জানুয়ারি : জার্মানি ও পোল্যান্ডের অনাক্রমণ চুক্তি।

১৮ সেপ্টেম্বর : সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসঙ্ঘে যোগদান।

১৯৩৫

জানুয়ারি : রোমে মুসোলিনি-লাভাল আলোচনা।

১৬ মার্চ : জার্মানির বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগ এবং ভার্সাই সন্ধির সামরিক শর্ত উল্লঙ্ঘন।

১৪ এপ্রিল : স্ট্রেসা সম্মেলনের সম্মিলিত ঘোষণা।

১৮ জুন : ইঙ্গ-জার্মান নৌ চুক্তি।

২ মে : ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সন্ধি।

৩ অক্টোবর : ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের সূত্রপাত।

১৯৩৬

৭ মার্চ : জার্মানির রাইনল্যান্ড দখল ; রাইনল্যান্ডের পুনঃসামরিকীকরণের সূত্রপাত।

৯ মার্চ : ইতালির আবিসিনিয়া দখল।

১৮ জুলাই : স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সূচনা।

২৫ নভেম্বর : জার্মান-জাপানি কমিনটার্ন-বিরোধী চুক্তি।

১৯৩৭

৮ জুলাই : জাপান চীনের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করল।

সেপ্টেম্বর : জার্মানিতে মুসোলিনি ও হিটলারের সাক্ষাৎ।

৫ নভেম্বর : হসবাখ সম্মেলন।

৬ নভেম্বর	:	ইতালির কমিনটার্ন-বিরোধী গোষ্ঠীতে যোগদান।
১১ ডিসেম্বর	:	ইতালির জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ।
১৯৩৮		
১২ মার্চ	:	অস্ট্রিয়া ও জার্মানির 'সংযুক্তকরণ' (Anschluss)।
সেপ্টেম্বর	:	মিউনিখ সম্মেলন; চেকোশ্লোভাকিয়া দখলে জার্মানিদের পরোক্ষে উৎসাহদান।
১৯৩৯		
১৫ মার্চ	:	জার্মানির বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া দখল।
২১ মার্চ	:	জার্মানি পোল্যান্ডের কাছে ডানজিগ বন্দর ও পোলিশ করিডর দাবী করে।
২৩ মার্চ	:	জার্মানি লিথুয়ানিয়ার মেমেল বন্দর দখল করে।
৩১ মার্চ	:	ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।
১ এপ্রিল	:	স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের অবসান, একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
৭ এপ্রিল	:	ইতালির আলবানিয়া দখল।
২৮ এপ্রিল	:	জার্মান-পোলিশ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর।
২২ মে	:	ইতালি ও জার্মানির 'ইস্পাতের চুক্তি' স্বাক্ষর।
২৩ অগাস্ট	:	নাৎসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর।
২৫ অগাস্ট	:	ব্রিটেন ও পোল্যান্ডের মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর।
১ সেপ্টেম্বর	:	জার্মানির পোল্যান্ড অভিযান, ডানজিগ দখল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

৮.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১। ই. এইচ. কার—**ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনস বিটুইন দি টু ওয়ার্ল্ড ওয়ারস, ১৯১৯-১৯৩৯**।

২। এ. জে. পি. টেলর—**দি কোর্শ অফ জার্মান হিস্ট্রি।**

—**দি অরিজিনস অফ দি সেকন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার।**

৩। **অ্যান্ড্রু জে ক্রোজিয়ের—দি কজেস অফ দি সেকন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার।**

৪। উইলিয়াম কেলর—**টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ওয়ার্ল্ড।**

৫। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়—**আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস**। (ENTER)

—(অনুবাদ) ই. এইচ. কার—**দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।**

একক ৯ ❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল—ঔপনিবেশিকতার অবসান—মহাশক্তি হিসাবে আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য
৯.১ প্রস্তাবনা
৯.২ ভূমিকা
৯.২.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল
৯.২.২ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উৎপত্তি এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে সংঘাত
৯.২.৩ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
৯.২.৪ বিশ্বের রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন
৯.২.৫ ভাবাদর্শের সংঘাত—আদর্শগত বিরোধ
৯.২.৬ এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব
৯.২.৭ সমাজবাদের প্রসার
৯.২.৮ বিশ্বসংগঠনের আদর্শ প্রসার
৯.২.৯ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান
৯.২.১০ আফ্রো-এশীয় উপনিবেশ : বিরোধিতার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য
৯.২.১১ জাতীয়তাবাদের বিকাশ : ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান
৯.২.১২ চীনের ইতিহাসে এই তিনটি পর্যায়ের সুস্পষ্ট রূপ
৯.২.১৩ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাপানের অবস্থা
৯.২.১৪ নতুন এশিয়ার অভ্যুদয়
৯.২.১৫ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন
৯.২.১৬ মালয়েশিয়া
৯.২.১৭ ব্রহ্মদেশ
৯.২.১৮ ইন্দোনেশিয়া
৯.২.১৯ ইন্দোচীন
৯.২.২০ কাম্বোডিয়া
৯.২.২১ লাওস
৯.২.২২ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতার অবসান
৯.২.২৩ মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের উৎস ও স্বরূপ
৯.২.২৪ মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা
৯.২.২৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের সংকট : প্যালেস্টাইন সমস্যা
৯.২.২৬ মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব

৯.২.২৭ পারস্য
৯.২.২৮ মিশর বা ইজিপ্ট
৯.২.২৯ প্যালেস্টাইন সমস্যা : মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী সংকট
৯.২.৩০ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতা অবসানের ফলাফল
৯.২.৩১ ঔপনিবেশিকতার অবসান : আফ্রিকার জাগরণ
৯.২.৩২ জাতীয়তাবাদের বিকাশ : আফ্রিকা ও এশিয়া : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ
৯.২.৩৩ আফ্রিকার জাগরণের প্রতি পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া
৯.২.৩৪ আফ্রিকাতে ইসলামি জাতীয়তাবাদ
৯.২.৩৫ আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন
৯.২.৩৬ নিগ্রো স্বাধীনতা আন্দোলন
৯.২.৩৭ আফ্রিকার ঐক্য আন্দোলন
৯.২.৩৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে দুটি অতিরাষ্ট্রের উদ্ভব : আমেরিকা ও রাশিয়া
৯.২.৩৯ আমেরিকার উত্থান
৯.২.৪০ সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান
৯.৩ সারাংশ
৯.৪ অনুশীলনী
৯.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ উদ্দেশ্য

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছ-বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা চলেছিল। যুদ্ধের শেষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আবর্জনা থেকে এক নতুন পৃথিবীর প্রকাশ ঘটল, (যার সঙ্গে আগের পৃথিবীর কোন মিল ছিল না)। এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কত ব্যাপক ও বিভিন্ন ছিল।
- পৃথিবীতে দুটি মহাশক্তির আবির্ভাব, পৃথিবীকে দুটি মেরুতে বিভাজন।
- এশিয়াতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির একের পর এক পতন ঘটেছিল।
- নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।
- আফ্রিকাতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, তার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র।

৯.১ প্রস্তাবনা

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল। প্রবল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আশাবাদী ব্যক্তিরা ভেবেছিলেন যে শত্রুতার অবসানে কঠিন যুদ্ধের দিনগুলির ঐক্য বজায় থাকবে এবং তা শান্তির প্রতিশ্রুতি দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুটি বিরাট দেশ দুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করত। ফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হল। কখনো কখনো তা প্রকাশ্য যুদ্ধের চেহারা নিচ্ছিল, যেমন হয়েছিল কোরিয়া,

ভিয়েতনামে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপের নেতৃস্থানীয় দেশগুলি যেমন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল, আমেরিকার আর্থিক সাহায্য ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এভাবে আমেরিকা ইউরোপের অভিভাবক হয়ে উঠল। কিন্তু রাশিয়া তা মানতে চাইল না, সারা বিশ্ব আবার দুটি বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদ ও সংগ্রামী আদর্শ এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলির কাছে মুক্তির বার্তা নিয়ে এলো। আমেরিকা স্বভাবতই তা পছন্দ করল না। আমেরিকা তার অতুল বৈভব নিয়ে মুক্তিকামী দেশগুলোর পাশে এলে শুরু হল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যা পৃথিবীতে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি করল। কিন্তু এর মধ্যেই শান্তি চিরস্থায়ী করার জন্য বিশ্ব সংগঠনের জন্ম হল। আমেরিকা ও রাশিয়া—এই দুই অতিশক্তির উত্থান বিশ্বকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিল না।

৯.২ ভূমিকা

১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণ এই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করার আগে এই যুদ্ধের কারণ ও গতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার। যেমন সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ নয়। তেমন পোল্যান্ড আক্রমণও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নয়, এই কারণগুলি সংখ্যায় বহু ও বিচিত্র। ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি, জার্মানি ও ইটালিতে একনায়কতন্ত্রের উত্থান, ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, জাতিসংঘের ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একদিকে ছিল অক্ষশক্তি, যার অন্তর্গত ছিল জার্মানি, ইতালি, জাপান। অপরপক্ষে ছিল মিত্রশক্তি, যার মধ্যে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মান বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করার পর ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর ইতালি, রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান—একে একে সকলেই নিজ স্বার্থে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে যোগ দেয়। জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করার পর যুদ্ধ ঘোষণা করলেও ইঙ্গ-ফরাসি সৈন্যবাহিনী জার্মানি আক্রমণ করেনি। বরঞ্চ রাশিয়া পোল্যান্ডের কিছু অংশ এবং বাল্টিক রাজ্যগুলি যেমন, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া দখল করে নিল। এদিকে জার্মানির পর একে একে ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ দখল করে ১৯৪০ সালে ফ্রান্সে ঢুকে পড়ে। ১৯৪০ সালের ১৩ই জুন জার্মান সৈন্যরা প্যারিস দখল করে। এর আগে ফ্রান্সের ডানকার্ক বন্দরে জার্মানির সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে প্রায় তিন লক্ষাধিক ইঙ্গ-ফরাসি-বেলজিয়াম সৈন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেও আশ্চর্যজনকভাবে জার্মান বোমারু বিমান ও কামানের গোলা উপেক্ষা করে মিত্রপক্ষীয় সেনাপতিরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ছ-দিনের মধ্যে যুদ্ধ জাহাজ ব্রিটেনে সরিয়ে নেন। ঐ বিশাল সেনাবাহিনী জার্মানির হাতে বন্দী হলে মিত্রপক্ষের তখনই আত্মসমর্পণ করতে হত। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনির শাসনাধীন ইতালি জার্মানির সঙ্গে পূর্বেকার সন্ধি অনুসারে অক্ষ বাহিনীতে যোগদান করে এবং ফ্রান্সের ওপর আক্রমণ করে। জার্মানির আক্রমণে বিধ্বস্ত ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পল রেনো পদত্যাগ করলে জেনারেল পেঁতা দায়িত্ব নেন। তিনি জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর কাম্পেই এর বনাঞ্চলে এক পরিত্যক্ত রেলগাড়ির কামরায় যেভাবে অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল, ঠিক সেই স্থানে সেই কামরায় ১৯৪০ সালের ২১শে নভেম্বর ফরাসিদের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করানো হয়। ফ্রান্সের পাঁচভাগের তিনভাগ জার্মানি নিয়ে নিলে বাকি অংশে

ফিলিপ পেঁতার নেতৃত্বে ক্রীড়নক সরকার টিকে থাকে। পরে লণ্ডনে অবশ্য ফরাসি বাহিনী জেনারেল দ্য গাল-এর নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠন করে।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করায় রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেয় ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপান হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবারে বোমা নিক্ষেপের পর। এর আগেই জাপান যোগ দিয়েছিল অক্ষশক্তির দিকে, আমেরিকা সক্রিয় সাহায্য করতে শুরু করেছিল মিত্রশক্তিকে। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ দখল করে নেয়। জার্মানির রাশিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশ বাহিনী প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে। বিখ্যাত স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে রুশ মার্শাল ঝুকভ জার্মান সেনাপতি ফন পাউলাসের আত্মসমর্পণ আদায় করেন। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের পতন ঘটে। আগস্ট থেকে ব্রিটেনের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধের বিস্তার আমেরিকাকে উদ্বিগ্ন করল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্কিন সেনেটের অনুমোদনক্রমে মিত্রশক্তির অনুকূলে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অ্যাটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষর করে বিশ্বশান্তির আবেদন করলেও ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের আগ্রাসী নীতি আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাল। ইতালি উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ চালালে ব্রিটিশ সেনাপতি আর্চিবল্ড ওয়াভেল তা প্রতিহত করেন। জার্মান সেনাপতি রোমেল আফ্রিকাতে ইতালির সাহায্যার্থে গেলে ব্রিটেন মন্টগোমারিকে ও আমেরিকা প্যাটনকে পাঠাল। শেষপর্যন্ত আফ্রিকাতে মিত্রপক্ষের জয় হল। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে মুসোলিনির পতন হল। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালির নবগঠিত অ-ফ্যাসিস্ট সরকার মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হিটলারের জার্মান সৈন্য ইতালির সাহায্যার্থে গিয়েছিল কিন্তু তারা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কাছে পরাস্ত হল। ১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল মুসোলিনি ফ্যাসিবিরোধী উন্মত্ত জনতার হাতে ধরা পড়ে নির্মমভাবে প্রাণ হারালেন। অন্যদিকে মার্কিন জেনারেল আইসেন হাওয়ার-এর পরিচালনায় ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর থেকে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী দ্বিতীয় রণাঙ্গনে জার্মানিকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে মিত্রপক্ষের নৌবহর অভিযানে জার্মানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ঐ দিনটি Deliverance Day বা D-Day অর্থাৎ মুক্তি দিবস নামে বিখ্যাত। ১৯৪৪ সালের ২৫শে আগস্ট মিত্রবাহিনী প্যারিস দখল করে নেয়। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জার্মানির পতন দ্রুত শুরু হল। ১৯৪৫ সালের ২মে রাশিয়ার লালফৌজ বার্লিন দখল করে নেয়। ১৯৪৫ সালের ৭ই মে জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুজভেল্ট ও চার্চিল ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হয়ে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। এরপর ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে জার্মানির পট্‌স্‌ড্যাম শহরে এক সম্মেলনে মিত্রপক্ষ মিলিত হয়ে জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বললে জাপান প্রথমে অস্বীকার করল। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে জাপান বাধ্য হয়ে ১৪ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল।

৯.২.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো এত ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ পৃথিবীতে আর ঘটেনি। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ কোনো না কোনোভাবে এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই এই যুদ্ধের ফলাফল হয় অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হল। তারপর, এই যুদ্ধের

অবসানে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল সেই ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষ বারংবার ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন সম্পর্কে ঘোষণা জারি করছিল। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিরা একাধিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে অক্ষশক্তির কবল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং তাঁদের আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়গুলি ছিল। আশাবাদী ব্যক্তিরা সুনিশ্চিত হয়েছিলেন যে শত্রুতার অবসানে কঠিন যুদ্ধের দিনগুলির ঐক্য বজায় থাকবে এবং তা শান্তির প্রতিশ্রুতি দেবে।

৯.২.২ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উৎপত্তি এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে সংঘাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফল হল মিত্রপক্ষের মধ্যেকার যুদ্ধকালীন মৈত্রী এবং সহযোগিতার অবসান। ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া তাদের আদর্শগত বিভেদ ভুলে ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে এই সুসময় আর রইল না। সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা আরো বেশি শক্তিমান ও প্রভাবশালী হয়ে উঠল। তখন তারা বিশ্বের অধিকার ও নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল তার পরিণাম হল সমগ্র বিশ্ব দুটি শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে গেল এবং বন্ধুত্বের বদলে সৃষ্টি হল ঠাণ্ডা লড়াই।

৯.২.৩ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে কত প্রাণ ও কত সম্পদ নষ্ট হয়েছে তা আজও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়া যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আমেরিকা ততটা হয়নি। আবার, বিজিত দেশগুলির মধ্যে জাপান ও জার্মানির ক্ষতি হয়েছিল সর্বাধিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য হারাতে থাকে এবং হীনবল হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, ব্রিটিশ পণ্য আর বিশ্বের বাজারে রপ্তানি হত না। যন্ত্রপাতি, সার ও বীজের অভাবে কৃষিক্ষেত্র অনাবাদি পড়ে থাকে, ফলে সেখানে দেখা দেয় তীব্র খাদ্য সংকট। আমেরিকা থেকে গম আমদানি করতে হয়। অনুরূপভাবে, কাঁচামাল ও কয়লার অভাবে কল-কারখানায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। ব্রিটেনের ৪ লক্ষ লোক যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং লক্ষ লক্ষ লোক আহত হয়, ফলে ব্রিটেনে লোকবল (man-power) হ্রাস পায়। ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫০% হ্রাস পায় এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০০ মিলিয়ন পাউন্ড। যুদ্ধে ১৭০০ মিলিয়ন পাউন্ড জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। ব্রিটেন তার ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে যুদ্ধ ফেরত সৈন্যদের ভাতা ও পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দেয়। স্থল ও নৌবহর হ্রাস করতে বাধ্য হয়ে ব্রিটেন তার সামরিক শক্তি খর্ব করে। অনুরূপভাবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতা তার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়াকে কম মূল্য দিতে হয়নি। প্রায় দশ মিলিয়ন রুশ সেনা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিল, ১৫ মিলিয়ন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছিল। রাশিয়ার লোকসংখ্যার একদশমাংশ এই যুদ্ধে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির কোন সীমা ছিল না। পশ্চিম রাশিয়ার সমস্ত শহর ও গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব ইউরাল অঞ্চলে যে কলকারখানাগুলি অক্ষত ছিল অতি ব্যবহারে তাদের যন্ত্রপাতিগুলি ক্ষয় হয়ে যায়। অধিকাংশ কয়লাখনিগুলিতে হয় আগুন জ্বলতে থাকে নতুবা ভেতরে জল ঢুকে যায়। রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে যারা তখনও কর্মক্ষম ছিল তারা ছিল পরিশ্রান্ত ও প্রয়োজনের

তুলনায় কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে স্তালিন ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনকে গৌণ স্থান দিয়ে ভারি শিল্প গঠনের দিকে জোর দেন। যথেষ্ট পরিমাণ লোহা, ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ সম্পদ যাতে উৎপন্ন হয় সেদিকে স্তালিন তীক্ষ্ণ নজর দিলেন, কারণ যন্ত্রশিল্প, রেল, বিমান, মারণাস্ত্রের উৎপাদনে রাশিয়া পিছিয়ে থাকলে কোনদিন সে বৃহৎ শক্তি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই রাশিয়াতে সাধারণ লোকেদের জীবনযাত্রার মান ছিল বেশ নীচু। জার্মান সৈন্য এমনভাবে ঘোড়া ও গরুগুলিকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছিল যে লাঙল টানার পশু ছিল না। অপরদিকে, কৃষি শ্রমিক, ট্রাক্টর, সার ও বীজের যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে রাশিয়াতে ব্যাপক খাদ্য সংকট দেখা দিল। স্তালিন কৃষিক্ষেত্র সংগঠনের ভার দিয়েছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চভকে। তিনি ২,৫০,০০০ যৌথ খামারকে একত্রিত করে ৯৫,০০০ বৃহৎ খামারে পরিণত করেন, যেখানে ট্রাক্টর, বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার প্রয়োগ, উন্নত বীজ প্রয়োগ দ্বারা ফলন বাড়ান হয়েছিল। এইভাবে কৃষিতে ও শিল্পের মতো যান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আবাদ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপ সমগ্র বিশ্বে তার গুরুত্ব হারায় এবং একটি সমস্যাকীর্ণ মহাদেশে পরিণত হয়। ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। পরস্পরবিরোধী শিবিরের অস্তিত্ব ইউরোপকে বহুধা বিভক্ত করে রেখেছিল। বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হল, যার আশু সমাধান ছিল অত্যন্ত জরুরী। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, মধ্য ইউরোপ থেকে নাৎসী শক্তির বিলোপ সাধন, জার্মানিতে যাতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ঘটতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, পূর্বতন শত্রু দেশগুলির সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর পারমাণবিক বোমার প্রভাব, ক্ষতিপূরণ বিশ্ববাণিজ্যের পুনর্বাসন, বিভিন্ন জাতিসমূহের পরস্পরবিরোধী দাবি, নিরস্ত্রীকরণ এবং এশিয়া ও আফ্রিকাতে বিকাশমান জাতীয়তাবাদ।

৯.২.৪ বিশ্বের রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় এক ব্যাপক পরির্তন ঘটল। ইউরোপে জার্মানি ও ইটালির শক্তি ও প্রভাব প্রচণ্ড হ্রাস পেল। ফ্রান্স রূপান্তরিত হল একটি সমস্যা জর্জরিত দূর্বল রাষ্ট্রে। ব্রিটেনও তার পূর্বেকার ক্ষমতা ও সম্মান হারাল। রাশিয়া ও আমেরিকা বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। জার্মানি রাজনৈতিক সংহতি থেকে বঞ্চিত হয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে রইল। পূর্ব জার্মানিতে স্থাপিত হল কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থা, অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হল গণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র। পশ্চিম জার্মানি পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীতে যোগদান করল বলে দুই জার্মানির একীকরণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক তীব্র সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

৯.২.৫ ভাবাদর্শের সংঘাত—আদর্শগত বিরোধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে পরিস্থিতির অবনতি ঘটল। পূর্ব ইউরোপের প্রায় সর্বত্র কম্যুনিস্ট আন্দোলন শুরু হল। এর ফলে পোল্যান্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ফিনল্যান্ড—

প্রায় সকল দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবাধীন হয়ে পড়ল। এস্টোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া—এই তিনটি বাল্টিক রাজ্যের স্বাধীনতার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হল। ইউরোপের এই অঞ্চলে রুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল। ইতালি একটি তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে রূপান্তরিত হল। সোতার সমস্ত আফ্রিকান, উপনিবেশ হারাল, উপরন্তু যুগোশ্লোভিয়া ও গ্রীসকে তার রাজ্যের কিয়দংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এছাড়া, ইতালিতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। ফ্রান্স আলসেস ও লোরেণ নামক অঞ্চল দুটি ফিরে পেল, কিন্তু তার পূর্বতন ক্ষমতা ও গৌরব আর ফিরে এলো না। যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সুযোগে ফ্রান্স ও ইতালিতে কম্যুনিস্ট সক্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল। তবে উভয় দেশের জনসাধারণের ভোটে কম্যুনিজ্‌মের পরিবর্তে গণতন্ত্র জয়ী হয়েছিল।

৯.২.৬ এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

এশিয়ার অধিকাংশ দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তীকালে বেশীর ভাগ এশীয় দেশে অশান্ত ও উত্তাল জাতীয়তাবাদের জোয়ার হৃতবল পশ্চিমী দেশগুলির ঔপনিবেশিক শাসনজাল ছিন্ন করতে চেয়েছিল। দুই যুদ্ধের অন্তবর্তীকালে এশীয় দেশগুলিতে দেখা গেল বৈপ্লবিক আন্দোলন। ইউরোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে শাসক পশ্চিমী শক্তিরা শাসিতদের সামান্য হলেও কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই আন্দোলনগুলি সশস্ত্র রূপ ধারণ করল এবং একের পর এক এশীয় দেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান জন্ম নিল। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন হল ইন্দোনেশিয়া, বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) এবং সিংহল। সম্প্রতি স্বাধীনতা পেয়েছে মালব এবং সিঙ্গাপুর। ফরাসী ইন্দোচীনে চারটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল—ভিয়েতনাম, ভিয়েতামিন, কাম্বোডিয়া এবং লাওস। ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। কোরিয়া দুভাগে বিভক্ত হল। উত্তর কোরিয়াতে কম্যুনিস্ট চীন ও রাশিয়ার মদতে কম্যুনিস্ট সরকার ক্ষমতাসীন হল। দক্ষিণ কোরিয়া হল আমেরিকার প্রভাবাধীন অঞ্চল। মধ্যপ্রাচ্য জন্ম নিল একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র। ইরাক, ইরান সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা লাভ করল। মিশরে রাজতন্ত্র জায়গা করে দিল প্রজাতন্ত্রকে। এশিয়ার মতো আফ্রিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব অনুভব করেছিল। সুদান, টিউনিসিয়া, লিবিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশ পশ্চিমী দেশগুলির শাসনপাশ ছিঁড়ে ফেলেছিল। এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখনীয় কালো মানুষদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। গোল্ড কোস্ট (বর্তমান ঘানা) ক্যামেরুন্‌স্, মালি, নাইজেরিয়া, সোমালিল্যান্ড, কঙ্গো, টাঙ্গানাইকা প্রভৃতি নিগ্রো জনসাধারণ অধ্যুষিত দেশগুলিতে স্বাধীনতা সূর্যের উদয় ঘটেছিল।

৯.২.৭ সমাজবাদের প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বের সর্বত্র সমাজবাদ লক্ষ্যণীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজবাদী আদর্শের অনুকরণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হতে লাগল। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণের প্রবণতা দেখা গেল।

৯.২.৮ বিশ্ব সংগঠনের আদর্শ প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতাবাদ জন্ম নিল। একটি বিশ্বসংগঠন গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। যখন পৃথিবী আবার দুটি শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে গেল এবং আণবিক অস্ত্র উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল তখন জনমানসে এই আতঙ্ক সৃষ্টি হল যে যদি কোন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তবে সম্পূর্ণ মানব জাতি ও মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এই ভয়াবহ পরিণতি রোধ করার প্রয়াস থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা U.N.O. (United Nations Organisation) জন্মগ্রহণ করল।

৯.২.৯ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল আলোচনার সময় একাধিক দীর্ঘস্থায়ী পরিণামের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি ফলাফল সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা সম্ভবপর হলেও বর্তমান পাঠ্যাংশে এই আলোচনা আফ্রিকা ও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ও বৃহৎ শক্তি হিসাবে আমেরিকা ও রাশিয়ার বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রথমে আপনাদের কাছে এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের কথা আলোচনা করা হবে ও তারপর বলা হবে আমেরিকা ও রাশিয়ার কথা।

৯.২.১০ আফ্রো-এশীয় উপনিবেশ : বিরোধিতার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য

ইউরোপে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল ফরাসি বিপ্লবের সূত্র ধরে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিপন্থী আদর্শ ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিংশ শতকে এশিয়ায় জাতীয়তাবাদী তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা এই তরঙ্গাভিঘাতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল আরো অর্ধশতাব্দী পরে।

উনবিংশ শতকের চতুর্থ ও অন্তিম ভাগে আফ্রিকা ও এশিয়াতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। বিংশ শতক শুরু হয়েছিল এমন একটি ধারণা নিয়ে যে ইউরোপের সামরিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য রোধ করার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু ১৯৪৫ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে অন্তত ৪০টি দেশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের স্বাধীনতা আদায় করে নিয়েছিল।

এই বিরাট সংগ্রামের পূতাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল দুটি ঘটনা—একটি হল ১৯০৪-১৯০৫ সালে রুশ জাপান যুদ্ধ, যাতে রাশিয়া পরাজিত হয়েছিল জাপানের হাতে। এর দশ বছর পরে, শানটুঙ নামক স্থানে জাপান জার্মানিকে পরাজিত করল। অপরটি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের অভ্যুদয়। ১৯২০ সালে তাঁর হাতে ফ্রান্স ও ১৯২২ সালে গ্রীস পরাজিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কলহ এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর তাদের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে ভাঙ্গন স্পষ্ট রূপে দেখা দিয়েছিল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের একটি বড়ো অংশ তাঁর অধিকারে এসেছিল, কিন্তু তাঁর সামরিক বিজয়রথে আরোহণ করে জাতীয়তাবাদী আদর্শ সমগ্র ইউরোপে অতি দ্রুত বিস্তারলাভ করেছিল। ঠিক তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাতীয়তাবাদী আদর্শ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘোষিত

লক্ষ্য আর ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল না। উইলসনের চোদ্দ দফা নীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমভাবে ইউরোপে ও উপনিবেশগুলিতে প্রযোজ্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের এই ঘোষণা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দায় মুখর হয়ে জার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জাতিসমূহের পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী স্বীকার করলেন—এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্বে মুক্তি ও সার্বভৌমত্বের দাবি জোরালো হয়ে উঠল। ক্রমে আফ্রো-এশীয় জাতীয় আন্দোলন পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি সার্বিক বিদ্রোহে পরিণত হয়।

এছাড়াও ছিল বিশ্বরাজনীতির চাপ, যা ১৯৪৭-এর পর আকস্মিকভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে এনেছিল। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের বিরুদ্ধে এমন আঘাত হেনেছিল যে আর কোনোদিন ঐ তিনটি রাষ্ট্র উঠে দাঁড়াতে পারেনি। মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকাতে আমেরিকার চাপ সাম্রাজ্যবাদকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল।

৯.২.১১ জাতীয়তাবাদের বিকাশ : ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান

এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অনগ্রসরতা ও রক্ষণশীলতা অপসারণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধিপত্যের হাত থেকে নিজের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য নিজস্ব ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চতর শ্রেণীর মানুষরা জাতীয়বাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এদের হাতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ও উদারপন্থী। যদিও মার্কস্‌বাদী ঐতিহাসিকরা এই পর্বের জাতীয়তাবাদকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করেছিলেন তবুও একে সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবাদ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, আফ্রিকা ও এশিয়াতে শিল্পায়নের মাত্রা ছিল খুবই কম। কাজেই এখানে বুর্জোয়া অগ্রগতি ঘটেনি বললেই চলে। তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পরে। যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল।

৯.২.১২ চীনের ইতিহাসে এই তিনটি পর্যায়ের সুস্পষ্ট রূপ

উনিশ শতকের শেষের দিকে চীনের অনগ্রসরতা দূর করার জন্য ক্যান-ইউ-ওয়েই শতদিবসের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাঞ্চু রাজবংশ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলন সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। তখন এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করলেন সান-ইয়াৎ-সেন। ১৯১১ সালের বিপ্লবের ফলে মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটল ও চীনে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরোধিতা ও পাশ্চাত্য দেশগুলির শোষণ প্রজাতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলল। কুয়োমিনতাং দল গঠনকরে সান ইয়াৎসেন গণবিপ্লবের উপযোগী একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করলেন, যার কর্মসূচী হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার সাধন করা। চীনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল কম্যুনিস্ট দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কম্যুনিস্ট দল বা সি.সি.পি. (Chinese Communist Party) **কুয়োমিনতাং বা কে.এম.টি.** (Keo-Min-Tang) দলের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছিল। কিন্তু ১৯২৫ সালে সান-ইয়াৎ-সেন মারা গেলে চিয়াং কাইশেক নির্মমভাবে কম্যুনিস্ট নিধন শুরু করল। এমতাবস্থায় সি.সি.পি-র নেতৃত্ব দখল করলেন মাও-সে-তুং। তিনি জাপানি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব সি.সি.পি. নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। এর আগেই তিনি চীনা

সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করে ও ১৯৩৪-৩৫ সালের অক্টোবরে লঙ মার্চ দ্বারা দীর্ঘ সাড়ে সাতহাজার মাইল পথ অতিক্রম করে সি.সি.পি. পরিচালিত গণ আন্দোলনের ভিত্তি মজবুত করেছিলেন। ১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবর চীনের দীর্ঘ ও সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিণতি পেল গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

৯.২.১৩ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাপানের অবস্থা

পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাত জাপানে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা চীনের থেকে বিপরীত। চীন পশ্চিমী অনুপ্রবেশের চাপে ক্রমিক দুর্বলতা ও অস্থিরতার পথে ধাবিত হল। অন্যদিকে জাপান নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে এবং দ্রুতগতিতে পশ্চিমী দেশগুলির আদর্শে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। ১৮৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমোডোর পেরী জাপানকে উন্মুক্ত করেন। এরপর ১৮৬৮ থেকে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাপানে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটল এবং জাপান একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র থেকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হল। কারণ জাপানি রাজনীতিবিদরা উপলব্ধি করেছিলেন যে পশ্চিমী দুনিয়া থেকে দূরে সরে থাকা নয়, পাশ্চাত্যকরণের মাধ্যমেই জাপানের অগ্রগতি আসবে। এই নীতি অনুসরণ করে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারে শূন্য থেকে ২০০ মিলিয়ানে পরিণত হল। এরপর জাপান পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর অনুকরণে সাম্রাজ্যবাদের পথে পা বাড়ালো। সে সম্প্রসারণশীল নীতি গ্রহণ করে উনিশ শতকের শেষ দিকে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হল। দুটি দ্বন্দ্বেই জয়ী হয়ে জাপান সুদূর প্রাচ্যে নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হল। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় বিশেষ সুবিধার অধিকারী হয় জাপান এবং এর ফলে ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া গ্রাস করে নিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য দেশগুলো ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় জাপান বিনা প্রতিরোধে সুদূর প্রাচ্যে একক আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হল। চীনে জার্মানির অধিকৃত অঞ্চলগুলো জাপান করায়ত্ত করে এবং চীনের উপর পনেরো দফা দাবি আরোপ করল। ভার্সাই সম্মেলনের পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। ওয়াশিংটন সম্মেলনের মাধ্যমে আমেরিকা জাপানের নৌশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করতে সক্ষম হল। জাপান নৌবলে আমেরিকা ও ব্রিটেনের পরে স্থান পেল। শুধু তাই নয়, চীন ও রাশিয়ার থেকে অধিকৃত সমস্ত স্থান সে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। আমেরিকার উন্মুক্ত দ্বার নীতি তাকে সমর্থন করতে হল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে বাধ্য হল।

কিন্তু ১৯৩০ সালের পর জাপান পুনরায় সম্প্রসারণশীল হয়ে উঠল। প্রথমে মাঞ্চুরিয়া ও পরে চীন জাপ আক্রমণের শিকার হয়। ১৯৩৯ সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল জাপান দুর্বার গতিতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হল। এতে আমেরিকা যারপরনাই উদ্বিগ্ন হল। অবশেষে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান আমেরিকান ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করল। তখন আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

জাপানের আক্রমণে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিধ্বস্ত হয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের পরাজয় হলেও এশিয়ায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। জাপ আক্রমণের

ফলে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য ঘাঁটিগুলি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ১৯৪৫ সালে জাপান পরাজিত হল কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ আর এশিয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার ফ্যাসীবাদী শক্তিগুলির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। আবার, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের আঘাতে ক্ষীণবল হয়ে উঠল। তাদের পক্ষে সাম্রাজ্যের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। স্বভাবতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় নবযুগ এল এবং ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রমিক অবসান ঘটল। এই নবযুগের অভ্যুদয়কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ প্রতিরোধ করতে পারল না।

৯.২.১৪ নতুন এশিয়ার অভ্যুদয়

যুগ যুগ ধরে পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়ার উপর অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব করে এসেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পশ্চিমী দুনিয়া উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে আমেরিকা বা ইউরোপ নয়, এশিয়া, বিশ্বের শক্তিসাম্য নিয়ন্ত্রণ করবে। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী ছিল পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যের প্রাধান্যের যুগ। আরবরা শুধু দক্ষিণ ইউরোপের এক বড়ো অংশের কর্তৃত্ব ভোগ করত তাই নয়, আরব ছিল এক অত্যন্ত উন্নত সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। অ্যাটিলা, চেঙ্গিস খাঁন ও তৈমুরের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা ইউরোপের একটি বড়ো অংশ অধিকার করেছিল। পরবর্তীকালে তুর্কীরাও ইউরোপের একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতক থেকে রেনেসাঁর আদর্শের প্রভাবে, যান্ত্রিক শিল্পের বিকাশে, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের স্থাপনের দ্বারা উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধকৌশল এবং অর্থনৈতিক শক্তির বলে পাশ্চাত্য জগত ক্রমে ক্রমে প্রাচ্যকে গ্রাস করে নিল। এশীয় দেশগুলির উপরোক্ত শক্তিগুলির সবকটিরই অভাব ছিল। এছাড়া, এশীয় দেশগুলি ছিল মূলত কৃষিপ্রধান এবং কৃষি পদ্ধতি ছিল শতাব্দী প্রাচীন ও প্রকৃতি নির্ভর। একমাত্র জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে নিজেকে পাশ্চাত্য ধাঁচে বদলাতে পেরেছিল এবং একটি উন্নত শিল্পপ্রধান দেশে নিজেকে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু এশিয়ার আর কোনো দেশ এই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এশীয় দেশগুলির কতকগুলি মৌলিক সমস্যা ছিল। কৃষিপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমানতা জনিত প্রবল চাপ এখানকার জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী করে তুলেছিল। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে এশিয়ার প্রবল জনসংখ্যার চাপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন পৃথিবী পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক ঐক্য কূটনীতিক মেরুবিন্যাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। সুতরাং পশ্চিমী দেশগুলির পক্ষে আর পিছিয়ে পড়া এশীয় দেশগুলিকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। বিপুল জনগোষ্ঠীপূর্ণ অসীম সম্ভাবনাময় এই দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নে পশ্চিমী দেশগুলি তাই নিজেদের স্বার্থেই এগিয়ে এসেছিল। যেখানে আমেরিকা ও ব্রিটেন সহায়তা দানে ব্যর্থ হত, সেখানে এগিয়ে আসত রাশিয়া। কোরিয়া ও ইন্দোচীনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি করেছিল ক্ষতিকর যুদ্ধ। একই কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও জটিল চরিত্র ধারণ করেছিল। এভাবে, যেমন এশিয়া মেরুকরণের কূটনীতিকে রোধ করতে পারত, তেমনি আবার বিশ্বকে সে অধিকতর মেরু বিভাজনের দিকে ঠেলে দিতে পারত। কাজেই এশিয়ায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের গতিধারা বুঝে ওটা সম্ভবপর নয়।

৯.২.১৫ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে উত্তরপূর্বে জাপান ও উত্তর পশ্চিমে আয়ার্ল্যান্ডের মধ্যে যে ভূখণ্ড ভারত হল তার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। শুধুমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের দিকেই নয়, ভারত হল এশিয়ার মধ্যে প্রথম দেশ যেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দুই বৈশিষ্ট্য ভারতকে অত্যন্ত বিশিষ্টতা দান করেছে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারত এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার ভিত্তিভূমি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এশীয় রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক অভিযানের কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের পর, ব্রিটেন রণক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি গ্রহণ করেন।

কিন্তু ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর কোনো সহজ সমস্যা ছিল না। এখানে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতীয়দের প্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার দিচ্ছিল তখন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার সূচনা হল, এই বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল হিন্দু ও মুসলমান। ১৯৩৪ সালে মহম্মদ আলি জিন্না লন্ডন থেকে ফিরে এসে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনগুলিতে বোঝা গেল যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হল কখনোই মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বার্থ স্বীকার বা রক্ষা করবে না। ১৯৪০ সাল থেকেই জিন্না মুসলিম লীগকে একটি গণপ্রতিবাদী দল হিসাবে গড়ে তুললেন ও পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী শুরু করলেন। ১৯৪৩ সালে ক্রিপ্‌স্ মিশন ও ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন যে স্বাধীনতা প্রস্তাব দিল জিন্না তা সরাসরি নাচক করে দিলেন। সুতরাং, কংগ্রেস আর এমন দাবি করতে পারল না যে ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধি সে। অন্যদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজে ব্রিটেনের পক্ষে আর লীগের দাবিকে পাশে সরিয়ে রাখা সম্ভবপর হল না।

এরপর ক্ষমতা হস্তান্তর আলোচনায় লীগ ও কংগ্রেস পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল এবং যতটা সম্ভব বেশি সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করতে লাগল। এর পরিণামে ভারতের এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে শুরু হল দাঙ্গা। ভারতের উত্তরার্ধে আফগানিস্তান থেকে বার্মা পর্যন্ত শুরু হল সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড। এমতাবস্থায় ভারত ভাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। ব্রিটিশ সরকার স্থির করেছিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ভারতকে স্বাধীন করে ফেলতে হবে। ১৯৪৭ সালে জুন মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হল তাতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দুটি দেশ গঠনের কথা বলা হয়, একটি হল ভারতবর্ষ, অপরটি পাকিস্তান। উত্তর ভারতে হিন্দু ও শিখরা ভারতে চলে এল এবং মুসলমানরা পাকিস্তানে চলে গেল। কিন্তু দক্ষিণ ভারত এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত ছিল। সেখানকার মুসলমান অধিবাসীরা স্বস্থানে রয়ে গেল। তারা হল বৃহত্তম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী।

ভারত বিভাজন সত্ত্বেও আরো বহু সমস্যা রয়ে গেল। যেমন, দেশীয় রাজ্যসমূহের ওপর অধিকার। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেরা ঠিক করবে তারা কোন পক্ষে যাবে—ভারত না পাকিস্তান। হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর—এই তিনটি রাজ্য যেকোনো দিকে যেতে পারত। হিন্দু অধ্যুষিত অথচ মুসলমান শাসিত হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় ভারতের সঙ্গে যোগ দিল, কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা তৈরি

হল। আজও তার সমাধান হল না। মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীরের হিন্দুশাসক ভারতের সঙ্গে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরের অধিকাংশ দখল নিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সেখানকার মুসলমান উপজাতিদের সাহায্য করার নামে আক্রমণ চালাতে লাগল। ১৯৪৮ সালের পয়লা জানুয়ারি ভারত এবিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে নালিশ জানাল। চার্লস্ ডিক্সনের নেতৃত্বে একটি কমিশন কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল। কাশ্মীর কার্যত ভারতীয় ও পাকসেনাদের অবস্থান অনুযায়ী দুভাগে ভাগ হয়ে থাকল। তবে উভয় দেশই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিল যে কাশ্মীর থেকে সৈন্য অপসারণ করতে হবে ও সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্ধান্ত দুটি কার্যকর করার কাজে নিরন্তর চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হল। ১৯৫৭ সালে আবার নতুন করে যখন কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হল তখন দুই পক্ষের সম্পর্ক আরো অবনত হয়েছে। পাকিস্তান যেমন কাশ্মীরে গণভোট করার দাবি জাপান ভারত তেমন অনড় রইল এই দাবিতে যে গণভোটের আগে পাকসেনার অপসারণ আবশ্যিক। ভারত নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ভারত দাবি করল তা গণভোট। এদিকে পাকিস্তান আমেরিকার সাথে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগল, ভারতের মতে তা ছিল আশঙ্কাজনক। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ধুনদের জল ব্যবহার নিয়ে দুই দেশ যদিও একমত হল তবুও কাশ্মীর নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই অব্যাহত রইল। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিকাশে ভারতের স্বাধীনতা লাভ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা প্রক্রিয়া আর রোধ করা সম্ভব হল না। এর ফলে এশীয় পরিস্থিতি আমূল বদলে গেল। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এরপর যখন ব্রিটেনের এশীয় উপনিবেশগুলি একের পর এক স্বাধীনতা অর্জন করতে লাগল তখন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের কাঠামো সম্পূর্ণ বদলে গেল। আগে এটি ছিল একটি আঁটোসাঁটো ইউরোপীয় সংগঠন, এখন তা অনেক বিস্তৃত কিন্তু শিথিল কাঠামো, যেখানে ইউরোপীয়রা হল অনেক কম সংখ্যক। 'ব্রিটিশ' এই বিশেষণটি অচল হয়ে গেল। বিশ্বশক্তি হিসেবে ব্রিটেনের স্থান এর ফলে আমূল বদলে গেল। আগে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাদলকে পুবে অথবা পশ্চিমে প্রয়োজনমতো যেকোনো দিকে চালনা করানো যেত কিন্তু এখন আর তা সম্ভব ছিল না। মধ্যপ্রাচ্য সংকটে এর ফলে ব্রিটেন কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারল না।

ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাসে দুটি বিপরীত ধারায় অগ্রসর হল। নেহরু ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতকে পরিচালিত করেছিলেন। সেখানে জিন্না ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে মারা গেলেন। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান ১৯৫১ সালে নিহত হলেন। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ বহুজাতিক রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। এই আদর্শের খাতিরে তাকে কখনো কখনো অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। যেমন, নাগা উপজাতির স্বায়ত্তশাসনের দাবি নাচক কিংবা ১৯৬১ সালে পতুর্গীজ দখল থেকে গোয়া দখল করা। বিপরীত থেকে পাকিস্তান ছিল একটি মুসলমান রাষ্ট্র। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভারত অভিনবত্ব অর্জন করতে চাইল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে যে আশা করেছিল যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করার সুযোগ সে পাবে। পক্ষান্তরে, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ছিল আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মৈত্রীবদ্ধ, সে বাগদাদ ও ম্যানিলা উভয় চুক্তিতে যোগদান করেছিল।

৯.২.১৬ মালয়েশিয়া

মালয় দেশে ব্রিটিশ শাসন ছিল প্রজানুরঞ্জক স্বৈরতন্ত্র, যা পরিচালনা করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। ব্রিটিশ শাসন সেখানে নিয়ে এসেছিল আধুনিকতা, সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী। মালয়ের তিনটি প্রধান জনগোষ্ঠী মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়রা ব্রিটিশ বিরোধী ছিল না এই কারণে যে তাহলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। মালয়ে এগারোটি পৃথক সরকার ছিল আর অদূর ভবিষ্যতে এর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল না, অথচ অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে সেখানে ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছিল। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মালয়ে জাপানি সৈন্যের কাছে ব্রিটিশ বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। যখন ব্রিটিশ ভারতীয় যুগ্ম বাহিনী প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন জাপানে আণবিক বোমা বর্ষণের খবর এল। যুদ্ধের প্রয়োজন আর থাকল না ঠিকই কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী আর ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইল না। পক্ষান্তরে মালয় জনসাধারণ বিদেশি শাসন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিল অথচ তারা স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি।

তখন ব্রিটিশ সামরিক শাসনের পরিবর্তে সেখানে মালয় ইউনিয়ন নামে একটি অভিভাবক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হতে ব্রিটিশ সরকার তড়িঘড়ি মালয় যুক্তরাজ্য (Malay Federation) প্রতিষ্ঠা করল। ১৯৪৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ উপদেশের বলে তা কাজ করতে শুরু করল। এরপর ব্রিটিশ সরকার মালয় উপদ্বীপের লাভজনক রাবার ও টিন ব্যবসার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিল। কিন্তু এবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ঘটল কম্যুনিস্টদের, যারা ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মালয় কম্যুনিস্টরা ছিল একাধারে জাতীয়তাবাদী ও পুঁজিবাদবিরোধী। তারা বিদেশিদের বিতাড়িত করতে চাইত। নানা নাশকতামূলক কাজকর্ম যেমন অন্তর্ঘাত, ট্রেন ডাকাতি, রাবার গাছ ধ্বংস করা ইত্যাদিতে তারা জড়িত ছিল। প্রায় ৬,০০০ কম্যুনিস্ট নিয়ে গঠিত রেড গেরিলা বাহিনী জঙ্গল থেকে আক্রমণ চালাতে লাগল। এদের দমন করতে জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ ব্যয় হত।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত এলিট গোষ্ঠীও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য দাবি তুলেছিল। এদের জাতীয়তাবাদী বলে গণ্য করা হত। ব্রিটিশ সরকার স্থির করেছিল যে তারা জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করে কম্যুনিস্টদের প্রতিরোধ করবে। কম্যুনিস্টদের চাপে মালয় জাতীয়তাবাদীরা তাদের জাতিশত্রুতাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখল। ১৯৫৫ সালে যে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে Malay-Chinese-Indian Alliance Party (MCI) ৫২টি আসনের মধ্যে ৫১টি আসন লাভ করল। ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করল যে মালয়ে তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করতে লাগল।

১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে একটি চুক্তির দ্বারা ব্রিটিশ সরকার মালয়েশিয়ায় তাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাল। সিঙ্গাপুর একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে প্রকাশিত হল। ১৯৫৯ সালের ৩০শে মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে Peoples' Action Party ক্ষমতায় এল। তারা বৈদেশিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য ছিল, কারণ সামরিক অবস্থানগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সরকারের নৌ ঘাঁটি ছিল। এরপর মালয়ে আবার শান্তি ফিরে এল। যদিও মালয় গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা তার সরকারি বিদেশ নীতি হিসাবে গ্রহণ করল তবুও ঠাণ্ডা লড়াইতে তার সহানুভূতি রইল আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতি। কিন্তু নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল বলে ১৯১৬ সালে পরিকল্পনা করা হল যে, মালয়, সিঙ্গাপুর এবং উত্তর বোর্ণিও,

সাবা এবং সারাওয়াক—এই তিনটি উপনিবেশ নিয়ে গঠিত হবে মালয়েশিয়া যুক্তরাজ্য (Federation of Malayasia)। থাইল্যান্ড থেকে ফিলিপাইনস্ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি একক রাজ্য হবে এটি।

১৯৬৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে এশিয়ার সাথে ইউরোপীয়ান সম্পর্ক কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত যদিও MCI ক্ষমতাসীন ছিল তবুও দুর্ভাগ্যবশত মালয়ী ও চীনাদের মধ্যে জাতিগত বিরোধ শুরু হল। এর ফলে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় বহুজাতিক একটি রাষ্ট্রের পতন ঘনিয়ে এল। ১৯৬৯ সালে সিঙ্গাপুরকে যুক্তরাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হল এই অজুহাতে যে সেখানকার চীনারা যুক্তরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এরপর থেকে সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্র ও মালয়েশিয়ার সাংবিধানিক রাজতন্ত্র উভয়েই ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ্ ভুক্ত হল।

৯.২.১৭ ব্রহ্মদেশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রহ্মদেশ ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। ১৯৩৫ সালে পাশ হওয়া ব্রহ্মদেশ শাসন আইন (Government of Burma Act, 1935) অনুসারে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা হয়েছিল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এই সরকার অধিকাংশ বর্মীকে খুশি করতে পারেনি। কিন্তু কিছু বর্মী ভারত ব্রহ্মদেশের সমৃদ্ধির সিংহভাগ থেকে বঞ্চিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অসন্তোষ থেকে জন্ম নেয় Peasants Unions। ১৯৪২ সালে জাপানিরা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে রেঙ্গুন আর উর্বর ধান্যোৎপাদক অঞ্চল ইরাবতী উপত্যকা দখল করল। তারা সেখানে Independent Republic of Burma নামে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে কোনো দেশের থেকে ব্রহ্মদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। যখন ব্রিটিশ বাহিনী পিছু হঠছিল, তখন তারা পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছিল। এছাড়া, নিষ্ফল ভারত আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে জাপান তাকে ব্যবহার করেছিল। এর ফলে বর্মী শহর ও পরিবহণ ব্যবস্থা মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণের দ্বারা ক্রমাগত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। এর ওপর আবার বর্মী প্রতিরোধ বাহিনী ও জাপানিদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ হচ্ছিল।

এইভাবে ব্রহ্মদেশের মানসিক ও ঐহিক ক্ষতি তাকে নিঃশেষিত শক্তিতে পরিণত করেছিল। এমতাবস্থায়, চীনা-আমেরিকান বাহিনী উত্তর ব্রহ্মদেশ এবং ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী নিম্নব্রহ্ম অঞ্চল দখল করে নিল। ১৯৪৫ সালে এপ্রিল মাসে জাপান রেঙ্গুন ত্যাগ করল। পুতুল সরকার ভেঙে দিয়ে ব্রিটেন আবার ব্রহ্মদেশের শাসনভার গ্রহণ করল। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ব্রহ্মদেশে প্রশাসন সংক্রান্ত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশিত হল।

ঐ শ্বেতপত্রে এরকম ইঙ্গিত ছিল যে ব্রিটেন ব্রহ্মদেশে স্বাভাবিক সরকার পূনর্গঠন করতে চায়, নির্বাচনের মাধ্যমে এবং একটি সংবিধান গঠন করে ব্রহ্মদেশকে ব্রিটেন কমনওয়েল্থ্ ভুক্ত একটি স্বশাসিত দেশের মর্যাদা দিতে চায়। কিন্তু ব্রহ্মদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ এত সহজ ছিল না। যুদ্ধকালীন প্রতিরোধ বাহিনীর একজন নেতা উ আউং সান (U Augn San) ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বর্মীদের অধিকার চেয়ে তাৎক্ষনিক স্বাধীনতা দাবি করলেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আউং সান নিহত হলেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন উ নু (N Nu)। তিনি যে খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করলেন তাতে ব্রহ্মদেশকে Union of Burma বলে ঘোষণা করা হল। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী উপলব্ধি করলেন যে অন্তর্বিরোধ দীর্ণ ব্রহ্মদেশকে

আর ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত রাখা যাবে না। কাজেই উ নু লন্ডন গিয়ে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, যার দ্বারা ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হল।

স্বাধীনতার সময় থেকেই ব্রহ্মদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্রহ্মদেশ প্রথম কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। একই সঙ্গে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। যদিও পিকিং উনুকে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার বলে বর্ণনা করেছিল তবুও তিনি মুক্ত পৃথিবী ও কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যেকার বিরোধ থেকে পৃথক থাকতেন। তিনি জোর দিয়ে বলতেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা। তাঁর মত ছিল এই যে এশিয়ার প্রকৃত যুদ্ধ আদর্শবাদের লড়াই নয়, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই।

৯.২.১৮ ইন্দোনেশিয়া

১৯৩৯ সালের আগে জাভা, সুমাত্রা বোর্নিও এবং নিউগিনির বেশির ভাগ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল ইন্দোনেশিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ইন্দোনেশিয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট আদর্শ ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল, সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাচ সরকার জাতীয়তাবাদী নেতাদের কারারুদ্ধ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করেছিল। ১৯৪২ সালে জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে যখন জাতীয়তাবাদী নেতাদের মুক্তি দিল তখন সেখানে ডাচ শাসকদের বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলন গড়ে উঠল। জাপান আত্মসমর্পণ করার দুদিন পর ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় নেতা সুকর্ণ নেদারল্যান্ডস ইস্ট ইন্ডিজে ইন্দোনেশিয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করলেন। কিন্তু হল্যান্ডের ডাচ সরকার ঐ নতুন প্রজাতন্ত্রকে জাপানের উপগ্রহ বলে বর্ণনা করল, তাই ডাচ সরকার ঐ প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানাতে রাজি হল না।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নেদারল্যান্ডস ইস্ট ইন্ডিজের গভর্ণর জেনারেল ডাচ সরকারকে অনুরোধ জানালেন ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিষয়ে একটি ফয়সালা করার জন্য। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকারও ডাচ সরকারকে চাপ দিতে থাকল যে হল্যান্ড যেন ইন্দোনেশিয়ায় কমনওয়েলথ গঠন করার প্রস্তাবটি কার্যকর করে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সাথে আলোচনার জন্য জাভাতে একটি কমিশন এল। শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ও হল্যান্ডের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এর শর্তাবলি ছিল এই রকম—প্রথমত, ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হবে জাভা এবং ইন্দোনেশিয়া দ্বারা। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র, বোর্নিও এবং গ্রেট ইস্ট টেরিটরি (Great East Territory) নিয়ে গঠিত হবে একটি ইউনিয়ন এবং একটি সংবিধান পরিষদ ঐ ইউনিয়নের সংবিধান রচনা করবে। তৃতীয়ত, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে নেদারল্যান্ডস ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়ন পরিপূর্ণভাবে গঠিত হবে এবং এই ইউনিয়নের প্রধান হবেন নেদারল্যান্ডসের রানী। ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করবেন রানী। যুদ্ধবিরতির জন্য একমত হয়ে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে নেদারল্যান্ডস ও ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্র উভয়েই এই চুক্তি অনুমোদন করল।

কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্য চুক্তির শর্তসমূহ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি অন্তবর্তী সরকার গঠনের প্রয়াসও সফল হল না।

১৯৪৭ সালের মে মাসে ডাচ সরকার পাঁচটি দাবি সম্বলিত একটি চরমপত্র পাঠাল। প্রত্যুত্তরে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র মধ্যস্থতা চাইল। কিন্তু ডাচ সরকার কোনোরকম মধ্যস্থথা মানতে রাজি হল না। তখন, ব্রিটেন ও আমেরিকার চাপে উপায়ন্তর না দেখে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে রাজি হল এবং ডাচ সরকারের চারটি দাবি মানতে রাজি হল। কিন্তু ডাচ সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করল।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতের অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হল এবং যুদ্ধরত দুই পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করার সুপারিশ করল। প্রথমে উভয় পক্ষ রাজি হলেও ইন্দোনেশিয়া যুদ্ধবিরতি মানতে চাইল না এই অজুহাতে যে ডাচ সরকার তখনও গোপনে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা প্রস্তাবমতো নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য একটি কমিশন গঠন করল। ইন্দোনেশিয়া এই কমিশনের সুপারিশ মানতে রাজি হলেও ডাচ সরকার রাজি হল না। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, সিরিয়া এবং কলম্বিয়া ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের পাশে দাঁড়াল। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম হল্যান্ডকে সমর্থন করতে থাকল। আমেরিকা ও জাতীয়তাবাদী চীন অবশ্য হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক মীমাংসা কামনা করল।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নিয়োজিত কমিশন ডাচ-ইন্দোনেশীয় সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হল। ডাচ সরকার আবার আক্রমণ করতে শুরু করল। ১৯৪৯ সালে আমেরিকা তার পূর্বেকার নীতি পরিবর্তন করে ডাচ সরকারকে সমালোচনা করল, ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানাল, জাকার্তায় ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করল এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ সৈন্যের অপসারণ দাবি করল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে এশীয় ও আফ্রিকান দেশগুলির প্রতিনিধিরা নতুন দিল্লিতে একটি সম্মেলনে মিলিত হলেন ইন্দোনেশীয় সমস্যা আলোচনা করার জন্য। ১৯৪৯ সালে আমেরিকার প্রস্তাব ও দিল্লি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত একই ছিল।

দিল্লি সম্মেলনের অব্যবহিত পরে নিরাপত্তা পরিষদ যে সিদ্ধান্তগুলি নিল তা হল এই—রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, জাকার্তা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলি ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে ফিরিয়ে দিতে হবে, ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ সৈন্য অপসারণ করতে হবে, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে হবে এবং ১৯৫০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইউনিয়ন অব ইন্দোনেশিয়া গঠন সম্পূর্ণ করতে হবে। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে ডাচ সরকার ও ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এবং ডিসেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে ইউনিয়ন অব ইন্দোনেশিয়া ঘোষিত হল।

এইভাবে স্বাধীনতা পাবার পরও ইন্দোনেশিয়াতে শান্তি ফিরে এল না, কারণ জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রকোপে সেখানকার প্রশাসন ও রাজনীতি এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল যে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক ঐক্য কোনোটিই অর্জন করা সম্ভব হল না। ১৯৫৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত কোয়ালিশন সরকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়ীত্ব আনতে পারল না, এই সুযোগে ১৯৫৯ সালে সুকর্ণ ক্ষমতা দখল করে সংবিধান বাতিল করে দিলেন। তিনি তাঁর সামরিক শাসনের নাম দিলেন "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র" (Guided Democracy), বলা বাহুল্য এর মধ্যে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও ছিল না।

১৯৫৯ সালে একটি রাজনৈতিক ইস্তাহার প্রকাশ করে বলা হয়েছিল যে ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের প্রাথমিক দায়বদ্ধতা হল পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার

দেশগুলির সঙ্গে। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি হবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ মুক্ত এক পরিপূর্ণ শান্তিময় পৃথিবী। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রসমূহ, ইরাক ও যুগোশ্লাভিয়ার মতো নিরপেক্ষবাদের এক প্রধান সমর্থক। অবশ্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলি ঠাণ্ডা যুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার জড়িত না হওয়াকে পাশ্চাত্য বিরোধী ও কম্যুনিস্ট প্রবণ বলে অভিহিত করল।

৯.২.১৯ ইন্দোচীন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ফরাসী ইন্দো-চীন গঠিত ছিল লাওস, কাম্বোডিয়া, টনকিন, অন্নাম এবং কোচিন চীন নিয়ে। প্রথম চারটি ছিল ফ্রান্সের আশ্রিত এবং কোচিন চীন ছিল ফরাসি উপনিবেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে নেদারল্যান্ডস ইস্ট ইন্ডিজের মতো ইন্দোচীনেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ইন্দোচীন দখল করে এবং সেখানে ফরাসিদের বন্দী করে। ১৯৪৫ সালে ইন্দোচীন ছাড়ার আগে অন্নাম, টনকিন এবং কোচিন চীন সংযুক্ত করে ভিয়েতনাম নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, অন্নামের প্রাক্তন শাসক বাও দাই হলেন-এর শাসক।

১৯৪২ সালে অন্নাম-এর কম্যুনিস্টরা হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য একটি লীগ গঠন করল। এর নাম হল ভিয়েতমিন। জাপানের পতনের পর ভিয়েতমিন লীগ ভিয়েতনামকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। বাও দাইকে সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হল। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে দ্য গল সরকার ইন্দোচীনকে ফ্রান্সের শাসনাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য বলে ঘোষণা করল। আলোচনার সুবিধার জন্য ভিয়েতনাম ও ফ্রান্স যুদ্ধবিরতি মেনে নিল। কিন্তু ভিয়েতনাম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করল এবং কেবলমাত্র নামে ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে থাকতে চাইল। এর ফলে আলোচনা পণ্ড হল, ফ্রান্স ও ভিয়েতনাম আবার যুদ্ধ শুরু করল এবং ফ্রান্স ইন্দোচীনে এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য পাঠাল। তবে ভিয়েতমিন সেনাদের পালটা আক্রমণে ভীত ফ্রান্স ১৯৪৬ সালে ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিল। কিন্তু এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় আবার সংঘর্ষ দেখা দিল ফলে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভিয়েতমিনদের বাধা দেবার জন্য ফ্রান্স বাও দাই-র নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উৎসাহ দিতে লাগল। বাও দাই-র সঙ্গে একটি চুক্তি অনুসারে স্থির হল যে ভিয়েতনাম আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ভোগ করবে, কিন্তু তাকে ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে থাকতে হবে, এবং সেজন্য ভিয়েতনামে একটি ফরাসি সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকবে। কাম্বোডিয়া এবং লাওস ফরাসি ইউনিয়নে যোগ দিতে রাজি হল এবং বিনিময়ে ১৯৪৯ সালে তারা 'হোমরুল'-এর মর্যাদা লাভ করল। বাও দাই-এর শাসনাধীন ভিয়েতনাম ব্রিটেন ও আমেরিকার স্বীকৃতি পেলেও বাও দাই ভিয়েতনামের রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হলেন। হো চি মিন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেন।

ইন্দোচীনের ঘটনাবলি প্রমাণ করল যে যতক্ষণ না পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে পাশ্চাত্যের প্রতি সমর্থন বিশিষ্ট কোন শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ ভিয়েতনামে ফ্রান্সের আধিপত্য বজায়রাখা যাবে না। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ইন্দোচীনের গৃহযুদ্ধ এক নতুন মাত্রা পেল। হো চি মিন এক নতুন সামরিক কৌশল গ্রহণ করলেন। তাঁর রণনীতি ছিল ত্রিবিধ—জনমানস জয় করা, শত্রুদের সরবরাহ বন্ধ করা এবং শক্তিশালী শত্রুঘাঁটিগুলি বিচ্ছিন্ন করা আর সবচেয়ে শেষে তা আক্রমণ করা। শীঘ্রই উত্তর ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টরা বা ভিয়েতনামীরা ফরাসি ঘাঁটিগুলির সরবরাহ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হল।